Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501088

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Rabindranath Tagore: Poet of the soil and people

রাবীন্দ্রিক মানবতাবাদ: মাটি ও মানুষের কবি

Dr. Sutapa Saha
Assistant Professor
Music Department
Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya, Purba Medinipur

Received on: 26th April 2026
Accepted on: 09th May 2026

Abstract:

In Rabindranath’s view, a human being is not merely a physical entity; within lies the ‘religion of man’ — or humanity itself. He portrayed the lives of the exploited and the neglected with profound reverence in his literature. Throughout his life, he sought to recognize and honor that enduring human aspiration — rooted in truth — towards the overlooked masses of his homeland. He was not merely a ‘World Poet’ (Visva-Kabi); in the truest sense, he was a poet of the soil and its people. The nature of Bengal, the joys and sorrows of ordinary folk, their pangs of separation, and the vibrant rhythms of their lives found exquisite expression in his works — particularly in ‘Sonar Tari’, ‘Chhinnapatra’, and various poems centered on rural life. Rabindranath’s humanism was not confined to the web of scholarly theory; rather, it was embodied through active engagement and service. We witness a successful and practical application of this philosophy in his initiatives within the communities of Shilaidaha and his rural reconstruction efforts at Sriniketan.

Key Words:

Rabindric humanism, universal humanity, nature and man, rural reconstruction, folk life, social responsibility, integral being.

মূল প্রবন্ধ

ভূমিকা:

আজকালকার এই যান্ত্রিক আর স্বার্থপর পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে বারবার মনে আসে রবীন্দ্রনাথের সেই চিরন্তন সত্যকে — ‘মানুষের ধর্ম’। কারণ আমরা যত বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছি, তত বেশি নিজেদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি। সেই কারণেই উক্ত শিরোনামের প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম যা আমি ‘রবীন্দ্রনাথ’ পাঠের মধ্য দিয়েই অনুধাবন করেছি। মাটির কাছাকাছি থাকা সাধারণ মানুষের যে সারল্য, তাদের যে জীবন সংগ্রাম — সেটাই তো প্রকৃত জীবন। রবীন্দ্রদর্শনে ‘মাটি’ কেবল ধুলিকণা নয়, তা হলো জননী, আর মানুষ কোনো পরিসংখ্যান নয়, সে হলো ‘অমৃতের পুত্র’।

বিষয়বস্তু: রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তায় ছিল পল্লি জীবন। জমিদারি তদারকির সূত্রে গ্রামবাংলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। সাধারণ মানুষের কাছে গিয়েছেন। তাই পল্লী জীবন ও গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা তাঁর জমিদারী অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। প্রকৃতির সাহচর্যে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্য, অসহায়ত্ব দেখে ব্যথিত হয়েছেন। তাদের আত্মনির্ভরশীল করতে সমবায় প্রথা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি এবং 'শ্রীনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ স্বদেশ পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে তিনি মনুষ্য সমাজ গঠন করতে চেয়েছেন। এবং তিনি চেয়েছিলেন মানুষের উদারচিত্ত সংগমে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত মানসতীর্থ।

রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র মানেই, জমিদারী ও পল্লী জীবন। শিলাইদহ ও পতিসরে জমিদারী দেখাশোনা করার সময় গ্রামের মানুষের কাছে গিয়েছেন, যা তাঁর জীবন ও সাহিত্যকে নতুন দিশা দেখিয়েছে। তাঁর জমিদারি পরিচালনার সময় ছিল পল্লী দর্শনের বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্র। শিলাইদহ, পতিসর ও শাহজাদপুরে অবস্থানকালে প্রজা-হিতৈষী জমিদার হিসেবে সমবায় প্রথা, কৃষি-ব্যাঙ্ক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং কুটির শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে গ্রাম্য জীবনের দুঃখ দূর করতে চেয়েছেন। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি 'শ্রীনিকেতন' স্থাপন করে গ্রাম পুনর্গঠনের মডেল তৈরি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জমিদারী ও পল্লি দর্শনের মূল ভাবনা ছিল প্রজা-হিতৈষী দৃষ্টিভঙ্গি, সমবায় প্রথা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পল্লী পুনর্গঠন (শ্রীনিকেতন), বিচার ব্যবস্থা, কৃষি ও উৎসব। তিনি প্রজা-নিপীড়ক জমিদার ছিলেন না, বরং তাদের কষ্টে সমব্যথী ছিলেন। প্রজারা ভালোবেসে তাকে 'তুমি' থেকে 'তুই' বলে ডাকত। কৃষকদের ঋণের দায় থেকে মুক্তি দিতে পতিসরে কৃষি ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীনিকেতন স্থাপন করে গ্রামের শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, এবং স্থানীয় নারীদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নিয়েছেন। গ্রামীণ বিবাদ মেটাতে স্থানীয় লোকদের নিয়ে 'বিচার সভা' (গ্রাম আদালত) প্রবর্তন করেছেন যা ছিল তাঁর স্বনির্ভরতার দর্শনের অংশ। তিনি কৃষিভিত্তিক জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতিকে মেলাতে 'হলকর্ষণ', 'বৃক্ষরোপণ', ও 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবের প্রবর্তন করেছেন। তিনি জমিদারী হিসেবে শুধুমাত্র খাজনা আদায়ের মধ্যে ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বাংলার পল্লী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের সেতু। তাঁর এই পল্লী উন্নয়ন চিন্তা ও কার্যক্রম তাকে যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকা একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও সাহিত্য ছিল আনন্দের উৎস, শিক্ষার ক্ষেত্র এবং আধ্যাত্মিক সঙ্গী। তাঁর সৃষ্টিতে প্রকৃতি ও মানবাত্মা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। পদ্মা নদীর বুকে বোটে কাটানোর সময়ে 'গল্পগুচ্ছ' ও 'ছিন্নপত্র' রচনা করেছেন, যেখানে পল্লী প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের জীবন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শিলাইদহ ও পদ্মা প্রকৃতির সান্নিধ্যে তাঁর কবিমানস পুষ্ট হয়েছে, যা তাঁর কবিতা, গান ('গীতবিতান'), গল্প ও উপন্যাসে সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

মানুষের প্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দিতে গেলে একদিকে আমাদের সংস্কৃতির ও অনুভবের সাহিত্য যেমন জানতে হবে, আবার এগিয়ে যাবার শক্তি পেতে সমষ্টি জীবনের ওপর ভরসা রাখতেই হবে। স্থানীয় উপাদান, স্বশিক্ষিত সাধারণ মানুষের গৃহকোণ গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা, সনাতন শিল্প কুশলতা ও জলবায়ু আবহাওয়া মৃত্তিকার বিষয়ে তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়ে উপযোগী বাস্তু ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। যেমন রবীন্দ্রনাথ 'চৈত্য', 'কালোবাড়ি' কিংবা 'শ্যামলী' প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে নির্মিত পরিবেশে মানুষ-প্রকৃতি ও প্রাণী সকলেই প্রায় মর্যাদায় বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মানুষের ঘর এমন হওয়া উচিত যা মাটির সঙ্গে যুক্ত। তাই 'শ্যামলী' তৈরিতে তিনি ইটের বদলে শুধু মাটি ব্যবহার করেছিলেন। এমনকি ছাদটিও ছিল মাটির তৈরি। এটি ছিল তৎকালীন স্থাপত্যরীতির এক অনন্য পরীক্ষা। 'কালোবাড়ির' দেয়ালে কয়লা আর আলকাতরা মাখিয়ে তার ওপর নন্দলাল বসু ও রামকিঙ্কর বেইজের মতো শিল্পীরা অসাধারণ সব ভাস্কর্য খোদাই করেছিলেন। এটি ছিল মূলত শিক্ষার্থীদের হোস্টেল, যেখানে বাস করাটাই ছিল এক প্রকার শিল্পচর্চা।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার গ্রামীণ কুঁড়েঘরের সরলতাকে আধুনিক স্থাপত্যের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন। তিনি সাধারণ উপকরণ (যেমন মাটি, কয়লা, হাঁড়ি) ব্যবহার করে প্রমাণ করেছিলেন যে সাধারণ সামগ্রী দিয়েও অসাধারণ কিছু তৈরি সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এই

বাড়িগুলির মাধ্যমে এমন এক জীবনশৈলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে বাসগৃহ-প্রকৃতি-শিল্প আলাদা কোনো সত্তা নয় বরং একে অপরের পরিপূরক।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের অদূরে সুরুল গ্রামে গ্রামীণ পুনর্গঠন কেন্দ্র বা শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার লক্ষ ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও গ্রামীণ মানুষের আত্মশক্তি জাগানো। এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ ছিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি উন্নয়ন, কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, গ্রামীণ শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করে পল্লি জীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন। গ্রামের মানুষদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করার জন্য বয়নশিল্প, মৃৎশিল্প, চামড়ার কাজ, এবং বাটিক প্রিন্টিংয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। গ্রামের শিশুদের জন্য 'শিক্ষা-সত্র' এবং বয়স্ক ও অশিক্ষিত মানুষদের শিক্ষার জন্য 'লোকশিক্ষা সংসদ' প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি গ্রামীণ নারীদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে মহিলা সমিতি গঠন করেছেন। তাঁর এই পরিকল্পনা পল্লী সমাজকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করে একটি আত্মনির্ভরশীল সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের আধুনিক কৃষি পদ্ধতি শেখানোর জন্য নোবেল পুরস্কারের অর্থের একটি অংশ ব্যবহার করে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বা সমবায় প্রথা চালু করেছেন। তিনি কৃষি ও সমবায় ভাবনার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণ চেয়েছেন। শ্রীনিকেতনে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের কেন্দ্র স্থাপন করে উন্নত চাষাবাদ ও শিক্ষা প্রসারে কাজ করেছেন যা গ্রামীণ উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীলতার মডেল হিসেবে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ দ্বন্দ্ব নিরসনে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা বিচারসভা গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন যা ইউনিয়ন পরিষদের আদলে ছিল। তাঁর সৃষ্টিকর্মে বিচার ব্যবস্থা, ন্যায়বিচার এবং আইনের জটিলতা বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর 'বিচারক' গল্পে বিচারকের ব্যক্তিগত আবেগ ও পেশাগত দায়িত্বের দ্বন্দ্ব, 'হালখাতা'র 'সূক্ষ্ম বিচার'এ হাস্যরসের মাধ্যমে আইনি ফন্দিফিকির এবং 'রক্তকরবী' নাটকে যক্ষপুরীর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের দাবি পরিলক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দর্শনেও এই বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পরিলক্ষিত হয়েছে। 'বিচারক' গল্পে বিচারক তার প্রাক্তন প্রেমিকার ওপর মামলার রায় দিতে গিয়ে নিজের আবেগ ও ন্যায়বিচারের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়েছেন। এখানে বিচার ব্যবস্থার মানবিক দিক উঠে এসেছে।

তিনি গ্রাম্য শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের স্বাক্ষরতার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর কাছে পল্লী উন্নয়ন মানে ছিল শুধুমাত্র ভৌতিক উন্নয়ন নয়, বরং মানুষের ভিতরের 'আত্মশক্তির বিকাশ'। তিনি শহরের বিলাসিতা ছেড়ে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের জীবনমান উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন ছিল গ্রাম্য শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের স্বাক্ষরতার ওপর ভিত্তি করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, পল্লী উন্নয়ন মানে শুধুমাত্র ভৌতিক বা অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, বরং মানুষের ভিতরের আত্মশক্তি জাগিয়ে তোলা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সুশিক্ষার বিস্তার করা।

কবিগুরুর কাছে বাংলার প্রকৃতি কেবল নিছক দৃশ্যপট ছিল না বরং তা ছিল তাঁর চেতনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর সাহিত্য, সংগীত এবং জীবনদর্শনে বাংলার মাটি ও জলের যে উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি, তা নিছক সৌন্দর্য বর্ণনা নয়, তা এক গভীর আত্মিক সংযোগ। তাঁর এই প্রকৃতি চেতনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছিল জমিদারী পরিচালনার সময় শিলাইদহ ও পতিসরের দিনগুলিতে। পদ্মার বুকে নৌকায় বাস করার সময় তিনি বাংলার নদীমাতৃক রূপকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। 'ছিন্নপত্র'এ তাঁর সেই মুগ্ধতার কথা বারবার উঠে এসেছে। তিনি অনুভব করতেন এই বাংলার ধুলামাটির সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান। তাই তিনি অনায়াসেই লিখতে পারেন —

"বাংলার মাটি, বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।" (গীতবিতান)

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেম কেবল আধ্যাত্মিক ছিল না, ছিল মৃত্তিকা-সংলগ্ন। তিনি বাংলার মাটির ধুলোবালিকে পবিত্র মনে করতেন। তাঁর গানে ও কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে পল্লীবাংলার সহজ সরল রূপ। প্রকৃতির সঙ্গেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন

পরমেশ্বরের অস্তিত্ব। এই অনুভবে যখন তিনি বলতে পেরেছিলেন "বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক" — তখন বোঝা যায় এই বাণী কেবল উপরিতলের বাণী হয়েই থেকে যায়নি। গভীর অনুভূতি এবং নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি সমাজের অবহেলিত বা নিচুতলার মানুষের জীবনকে রূপদান করেছেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি যখন তাঁর গানে ব্যক্ত করেন 'আলোর নাচন পাতায় পাতায় ("এই তো ভালো লেগেছিল, আলোর নাচন পাতায় পাতায়") — তখন মনে হয় এরকম দেখার চোখ আমাদের মধ্যে অতি সরলতা দিয়েও আমরা জাগাতে পারব না। আসলে তাঁর মনের প্রবেশদ্বার ছিল অবারিত — যা আসলে অন্তর আর বাহিরের সংযোগে তৈরি এক অনন্ত জীবন ক্যানভাস।

তাঁর কাছে সৃষ্টি কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছিল না, বরং তা ছিল তাঁর অন্তরের উদ্বৃত্ত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে ছিল এক সৃষ্টিশীল আত্মা। যে আত্মার সংযোগে তিনি শিল্পকে এক আনন্দের দ্বারে নিয়ে যেতে পারতেন। সেই আনন্দধারাই বয়ে চলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যার পরিপূর্ণ রূপ পায় নান্দনিক দূরত্ব (Aesthetic distance), নান্দনিক অনুভব (Aesthetic feeling) এবং নান্দনিক আবেগের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারির তদারকির সূত্রে বাংলার সাধারণ মাটি, নদী ও কৃষকের জীবনের সঙ্গো নিবিড়ভাবে মিশেছেন যা তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পদ্মা তীরের গ্রাম্যজীবন, প্রকৃতির রূপ এবং মানুষের সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতাই মূলত 'সোনার তরী', 'গীতাঞ্জলি'সহ বহু বিখ্যাত ছোটোগল্প ও কবিতার উপাদান জুগিয়েছে। তিনি শিলাইদহকে তাঁর 'যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্য-রস-সাধনার তীর্থস্থান' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর 'ছিন্নপত্র' বা 'গল্পগুচ্ছ'এ সাধারণ মানুষের জীবনের বাস্তবচিত্র হিসেবে উঠে এসেছে। তিনি স্থানীয় বাউল ও লোকজ গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে স্বদেশিযুগের অনেক কালজয়ী গান রচনা করেছেন। বিশেষত এই প্রসঙ্গো তিনি লালনের গানের কথা সংগ্রহ করে প্রবাসীতে ছাপিয়েছিলেন। শিলাইদহে অবস্থানকালীন অভিজ্ঞতাই তাঁর প্রকৃত 'বাংলার কবি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ এবং প্রকৃতি একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে উন্নয়ন সমর্থন কখনো নয়। তিনি গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং কৃষিভিত্তিক উন্নয়নের কথা বলেছেন যা আজকের দিনের টেকসই উন্নয়ন বা 'Local Development'এর সমতুল্য। শান্তিনিকেতনে তিনি বৃক্ষরোপণ উৎসবের সূচনা করেছেন যা পরবর্তী সময়ে ভারতের বনমহোৎসবে রূপ নিয়েছে। তাঁর সাহিত্য ও নাটকে ('রক্তকরবী') প্রকৃতির উপর মানুষের অসংবেদনশীল অত্যাচার ও পুঁজিবাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি প্রথাগত শিক্ষার বদলে প্রকৃতির মাঝে শিক্ষার উপর জোর দিয়েছেন যার নিদর্শন শান্তিনিকেতন। তাঁর এই পরিবেশগত দর্শন আজও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনের সাধারণ আনন্দ, বেদনা, বিরহ ও বিচিত্র কলরব নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সাধারণ পাঠককে আজও আপ্লুত করে। তিনি শুধুমাত্র বিশিষ্টজন বা উচ্চবিত্তের কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের প্রাণের কবি। সমাজের সাধারণ নারী-পুরুষের অন্তঃপুরের কথা, তাদের অবদমিত আবেগ এবং অস্তিত্বের লড়াইকে গদ্যছন্দে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেখানে অসাধারণের আড়ালে সাধারণের জয়গান গাওয়া হয়েছে।

'পোস্টমাস্টার' গল্পে গ্রামীণ শান্ত প্রকৃতির সঙ্গো রতনের সরল ভালোবাসার বিষাদময় রূপ। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে বিদেশি মিনির সঙ্গো কলকাতার বাঙালি পরিবারের সঙ্গো মানবিক সম্পর্কের গভীরতা। 'শাস্তি' বা 'দেনাপাওনা' গল্পে গ্রামীণ সমাজের কুসংস্কার, দরিদ্র এবং নারীর প্রতি অবিচারের কঠোর বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন ১৩৩০ বঙ্গাব্দে। আবার পাঁচ বছর পরে সেই একই প্রসঙ্গা উত্থাপন করেন। অসহায় অরণ্যবাসী গরিব উৎপীড়িত আদিবাসী সাঁওতালদের ওপরে ইংরেজ প্রভুদের নির্মম গুলিবর্ষণ কবিকে আন্তরিকভাবে বিচলিত করেছিল। তির ধনুক হাতে নিরীহ সাঁওতালরা মুখোমুখি হয়েছিল উন্নত অস্ত্র ও বন্দুক থেকে ছোঁড়া গুলির সামনে। তার পরিণতি কী ঘটেছিল তাই রবীন্দ্রনাথকে বেশি যন্ত্রণাকাতর করে তুলেছিল।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সাঁওতালদের প্রতি অবিচার কবিকে যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল এবং কলম ধরতে বাধ্য করেছিল সেই সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে রবীন্দ্রনাথ চিনতেন। শান্তিনিকেতনের পাশেই ছিল সাঁওতাল পল্লি। বছরের পর বছর ধরে তিনি দেখেছেন অনেক সাঁওতাল নারীপুরুষকে। এই জনগোষ্ঠীর সততা-সৌজন্য-সরলতা-পরিচ্ছন্নতা-ভদ্রতাবোধ ও বিনয় তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এরা কখনো করুণা চায় না। অসাধারণ পরিশ্রমী, পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করে। এরা গরিব কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধে দৃঢ়। এইসব গুণ কবিকে মুগ্ধ করেছিল। এই জনগোষ্ঠীর প্রতি মুগ্ধতা ছিল বলেই বিদ্রোহীদের প্রতিই ছিল তাঁর মমত্ব ও সহানুভূতি।

কবির হৃদয়ে সাধারণ মানুষের স্থান ঠিক সেইখানেই, যেখানে তিনি দেবতার অধিষ্ঠান অনুভব করেন। ‘নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা’ (‘গীতাঞ্জলি’) — সেই একলা চলার সাধনাই ছিল গীতাঞ্জলির সাধনা। এই সাধনা তাঁর মনের দিক থেকে, এই সাধনা নিজের দিক থেকে। তিনি এই পর্বে ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছেন সমাজের সেই সব সাধারণ মানুষের মাঝে, যারা ধুলোবালি মাখা সাধারণ মানুষের সঙ্গেই থাকেন। আড়ম্বর পূর্ণ পূজা করে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, বরং আভিজাত্যের অহংকার বিসর্জন দিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ালে তবেই সৃষ্টিকর্তার দেখা পাওয়া সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের ১০ নম্বর কবিতা বা গান:

> “যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন,
> সেইখানে সে চরণ তোমার রাজে,
> সবার পিছে, সবার নীচে, সব হারাদের মাঝে,
> … … …” (গীতাঞ্জলি)

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরও শান্তিনিকেতনে বসে বলেছিলেন এক ভাষণে — “পূর্ব সমুদ্রতীরের দেবতার উদ্দেশ্যে যে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলাম পশ্চিম সমুদ্রতীরের দেবতারা তাহা গ্রহণ করেছিলেন” (শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালা ভাষণ)। নোবেল পুরস্কার চাননি তিনি। এই মাটির একটা তিলক চেয়েছিলেন, কিন্তু সেইটুকুও আমরা দিতে পারিনি!

১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা ‘রাশিয়ার চিঠি’ গ্রন্থে অসামান্যতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ, যা তাঁর অনন্য মানবিক অনুভূতির অঙ্গ। তিনি বুঝেছিলেন, সুযোগ আর শিক্ষা পেলে সাধারণ মানুষও অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। তিনি অবাক হয়ে দেখেছিলেন যে, কয়েক বছর আগেও যারা একদম অশিক্ষিত চাষি বা মজুর ছিল, তারা এখন জ্ঞানচর্চা করছে। তিনি বুঝেছিলেন, মানুষকে টেনে তোলার চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। সাধারণ মানুষ সেখানে মাথা উঁচু করে বাঁচার আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়েছে। গ্রামের সাধারণ কৃষকরা যে অভাব আর অবহেলার মধ্যে পড়ে থাকবে সেই ধারণা রাশিয়ায় গিয়ে বদলে যায়।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের দারিদ্র দেখে রবীন্দ্রনাথ সবসময় তা অনুভব করতেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, “যা আমাদের দেশে ব্রিটিশরা ১০০ বছরে করতে পারেনি, রাশিয়া তা মাত্র ১০-১২ বছরে করে দেখিয়েছে।” (‘রাশিয়ার চিঠি’)। সেখানে সাধারণ মানুষ আর অবহেলিত নয়, বরং তারাই দেশ গড়ার মূল শক্তি। তিনি তাদের ভেতরের অক্ষয় প্রাণশক্তি ও সহজ মানবিকতাকে সভ্যতার আসল ভিত্তি মনে করতেন।

উপসংহার: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাস ভাবনা ছিল প্রচলিত রাজবৃত্ত বা রাজকাহিনি নির্ভর ইতিহাসের চেয়ে আলাদা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে, গানে, সাহিত্যে, সংগীতে, প্রবন্ধে, চিত্রকলায় মানুষকে ধরতে চেয়েছেন। সেই মানুষের ইতিহাস রচনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কোনো কিছুকেই তিনি অর্বাচীন করেন নি। যেখানে মানুষ উপেক্ষিত সেইখানেই তিনি দাঁড়িয়েছেন। মানুষের মধ্যে এক অপরাজেয় শক্তিকে তিনি দেখেছেন। মানুষকে দেবতা ভেবেছেন ‘হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নর দেবতারে… ।” উদারছন্দে তিনি তাদের বন্দনা করেছেন (‘ভারততীর্থ’)। তিনি বলেছেন, “মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব” (‘সভ্যতার সংকট’)।

‘ওরা কাজ করে’ কবিতায় তিনি এই নিম্নবর্গের মানুষের চমৎকার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্য আসে এবং চলে যায়, কিন্তু চাষী, তাঁতী বা শ্রমজীবী মানুষ — যারা যুগ যুগ ধরে মাটির ওপর কাজ করে চলেছে তাদের শ্রমই

শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তাঁর চোখে ইতিহাস একটি বহমান নদীর মতো, যেখানে উপরতলার ঢেউয়ের চেয়ে নীচের গভীর স্রোত বা সাধারণ মানুষের সংহতি অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই সর্বকালীন মানব জীবন সম্পর্কে তাঁর মধ্যে ধন্যতাবোধ জেগে উঠল যা প্রকাশ পেল গানে —

> "জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ
> ধন্য হলো, ধন্য হলো, মানবজীবন।"
> ('গীতবিতান', 'পূজা')

সহায়ক গ্রন্থ:

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গীতবিতান' (অখণ্ড সংস্করণ), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০০০
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানুষের ধর্ম', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৩৩
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভ্যতার সংকট', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৪১
৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আদিবাসী সমাজ' 'রবীন্দ্ররচনাবলী', চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৪২
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছোটেগল্প', 'রবীন্দ্ররচনাবলী', সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৩৯-৪০
৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শান্তিনিকেতন', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬৪
৭। প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ' (১ম ও ২য় খণ্ড), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৮
৮। অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'রবীন্দ্রনাথ', ইন্ডিয়ান পাবলিসিং হাউজ, ১৯১২
৯। সুকুমার সেন, 'রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা', ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৪৪
১০। শঙ্খ ঘোষ, 'এ আমির আবরণ', প্যাপিরাস, ১৯৮০
১১। শঙ্খ ঘোষ, 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক', প্যাপিরাস, ১৯৬৯
১২। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'কবি রবীন্দ্রনাথ', ভার বি, ১৯৬৬
১৩। নীহাররঞ্জন রায়, 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা', জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৪১
১৪। দেবকুমার ঘোষ, 'রবীন্দ্রনাথ মা, মাটি, মানুষ', 'রচনাবলী', ২০১৩
১৫। উমা দাশগুপ্ত, 'রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীনিকেতন', বিশ্বভারতী, ২০০০
১৬। প্রশান্তকুমার পাল, 'রবীন্দ্র-শিক্ষা ও দীক্ষা', আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪
১৭। সীতাংশু রায়, 'সংগীত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৮৮
১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীতচিন্তা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৬৬
১৯। Abu Sayeed Ayyub, 'Tagore's overset', Papyrus, 1980
২০। Edward Thomso, 'Rabindranath Tagore, Poet and dramatist', Oxford University, 1926

—